নৈতিকতার অবক্ষয় আর তারুণ্যের অধঃপতন ঃ আমাদের করণীয়

আবূসামীহাহ সিরাজুল ইসলাম

একটা জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার হয় তরুণ প্রজন্মের লালন ও বিকাশের। তরুণরাই নির্ধারণ করে কোন জাতির ভবিষ্যত অস্তিত্ব। এটা আসলে নতুন কোন কথা নয়। প্রতিটি জাতি ও সমাজের সদস্যরা তারুণ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জানেন। সমাজের বিদগ্ধ জনেরা এসব বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে থাকেন ও বিভিন্ন সময়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামও করে থাকেন। কখনো বা প্রচার মাধ্যমে এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব ও তথ্য বিতরণ করেন। কিন্তু তারুণ্যের উন্নয়নের জন্য আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ কি আদৌ করেছে? আর যদি করেও থাকে তা কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে?

একথা বলার এখানে সুযোগ রয়েছে যে আমাদের সরকার তারুণ্যের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে। সাথে সাথে বেসরকারী, ব্যক্তি ও সংস্থা-সংগঠনগুলোও বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য ও জাতীয় সম্পদে পরিণত করার জন্য সরকার ও বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠা করেছেন বা করছেন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সাংস্কৃতিক ও নাগরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তরুণদেরকে। নিঃসন্দেহে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনেক যোগ্য ব্যক্তি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যাঁরা আমাদের সমাজের বিভিন্ন দিকের নেতৃত্ব দান করছেন।

কিন্তু আমাদের তরুণ সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা হচ্ছে নেতিবাচক। বিগত বছরগুলোতে তরুণ সমাজের কৃত অপরাধের দিকে দৃষ্টি দিলে পুরো ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। তাদের জীবনের শৃঙ্খলাহীনতা, অনৈতিকতা, অসততা, অসহিষ্ণুতা, লোভ ও বিদ্বেষ এবং সংকীর্ণ মানসিকতা আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে অনেক সময়। সুস্থ চিন্তার সমাজ ও সংস্কৃতি কর্মীরা মাঝে মাঝে এসব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টাও করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বখে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা ও কলেজ ছাত্রদের সুপথে ফিরিয়ে আনার দিক-নির্দেশনা দিতে খান আতা নির্মাণ করেছিলেন 'আবার তোরা মানুষ হ' এর মতো কালজয়ী চলচ্চিত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত হানাহানির প্রতি কটাক্ষ করতে গিয়ে শিল্পী আব্দুল লতীফ গেয়েছিলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় – এখানে মানুষ মারা শিক্ষা দেয়া হয়।" জনাব আব্দুল লতীফ গান শেষ করতে পারেননি। তার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গানের মঞ্চ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন ছাত্রদের ধাওয়া খেয়ে।

দেশের অন্যতম এক শীর্ষ কবি তাঁর এক কবিতায় প্রশ্ন করেছিলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি ডাকাতদের গ্রাম? – বাল্যকালে যেমন কোন গাঁয়ের পাশ দিয়ে নাও বেয়ে ফিরতে গেলে মুরুব্বীরা বলতেন, ওপথে যেওনা, ওটা হলো ডাকাতদের গ্রাম।" ছিনতাই, রাহাজানি, সহপাঠী নির্যাতন, অবৈধভাবে হলে অবস্থান, জোড় করে ও বিনে পয়সায় খাওয়া এগুলো দেশের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠের অনেক ছাত্রেরই পেশা।

সহপাঠিনী ধর্ষণের মতো মারাত্মক অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতেও সামান্যতম দ্বিধা ও লজ্জাবোধ করে না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতির ভবিষ্যত কর্ণধারগণ। কয়েক বছর আগে দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি ছাত্র সংগঠনের এক নেতা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শততম ধর্ষণ উদযাপন করেছিলেন বন্ধুদের নিয়ে লাল পানির নহর বইয়ে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার ছাত্র থাকার সুবাদে আরো অনেক কীর্তিও দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। দেশের শীর্ষ দুই দলের ছাত্রসংগঠনের নেতাদের নেতৃত্বে ছুটির দিনগুলোতে হলের কমনরুমে চালানো হতো নীল ছবি রাত দশটার পর থেকে। দলবদ্ধভাবে সে কাজ করতে তারা একটুও কুণ্ঠিত হতেন না। বরং আমাদের মতো যারা এসব থেকে দূরে থাকতেন তারাই পড়তেন লজ্জার মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠানের নামে চলতো ছেলে মেয়েদের ঢলাঢলি আর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা।

এতো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র। বান্ধবীকে নিয়ে পাহাড়ের কোলে অনৈতিক কাজ করতে গিয়ে একবার নির্যাতনের শিকার হন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র গ্রাম্য রাখালদের হাতে।

ছাত্রদের চেয়ে কম যান না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকরাও। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে ছাত্রী নির্যাতনের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার শিকার হতে হয়েছে। এই শিক্ষকের কথা তো ছাত্রীটি সাহস করে বলেছেন বলে শাস্তি হলো। আরো কতো অনৈতিক শিক্ষক আছেন যাদের নির্যাতনের কথা অনেক ছাত্রীই লোকলজ্জা ও আত্মসম্মান খোয়া যাবার ভয়ে বলেন না।

অতি সম্প্রতি বুড়িগঙ্গায় যে বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটল, যেখানে বেশ কিছু তরুণ প্রাণ অকালে নিভে গেল, তার পেছনেও রয়েছে নৈতিকতাবর্জিত উচ্ছৃঙ্খল ইতরতা। একটা রক্ষণশীল(!) দেশের ৩ শতাধিক তরুণ তরুণী কিভাবে আনন্দ ভ্রমণে বেরোয় মুরুব্বীদের সাহচর্য ও দিক নির্দেশনা ব্যতিরেকে? বেহাল মাতলামী, মেয়েদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা সহ আরো অনৈতিক কার্যকলাপের জের ধরে সেদিন সংঘর্ষ হয়েছে ত্রিমূখী, যার পরিণতি অনেকগুলো তরুণ প্রাণের অকাল-বিয়োগ।

এভাবে ঘটনা টেনে আনতে গেলে তার কোন সমাপ্তি থাকবে না। প্রকৃত ব্যাপার হলো এ অনৈতিক ও উচ্ছৃঙ্খল পরিমন্ডলে বেড়ে উঠা এ সমস্ত তরুণরা যখন সমাজের দায়িত্বশীল পর্যায়ে পৌঁছে তখন তারা সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

এজন্য আমরা দেখি এ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে আসা নেতাদের মধ্যে নেই পরমতসহিষ্ণুতা। দেশ ও জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন ব্যক্তিগত আখের গোছাতে। সততা ও কুরবানীর পরিবর্তে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন মিথ্যাচারের মাধ্যমে জনসম্পত্তির আত্মসাতে। দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার অভাবে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন না জাতিকে। তাদের মধ্যে থাকে না কোন অন্তঃদলীয় বা আন্তঃদলীয় শৃঙ্খলাবোধ। স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চান সবকিছু। আর যদি তারা কখনো ক্ষমতার অংশীদার হতে পারেন তাহলে জনসম্পত্তির ব্যক্তিগত ভোগদখল হতে পড়ে তাদের অনেকের প্রধানতম লক্ষ্য। জাতিকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করার পরিবর্তে অকল্যাণের আবর্তে বেঁধে ফেলেন তারা। দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটান তারা। জনগণ ও তাদের মধ্যে তৈরী হয় এক অদৃশ্য দেয়াল। যে দেয়াল ভেদ করে তাদের কাছে পৌঁছা সাধারণ জনগণের জন্য হয়ে পড়ে দুঃসাধ্য।

অনৈতিক ও উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশে বড় হয়ে উঠা এসব তরুণরা যদি আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পান তাহলে তারা দুষ্টের দমনের পরিবর্তে তাদের সহযোগী হয়ে পড়েন। আর ঘুষখোরী সহ অন্য সব অনৈতিক ও বেআইনী পন্থায় ব্যক্তিগত সম্পদের পাহাড় গড়ার দিকে খেয়াল করেন বেশী। এজন্য অন্যায়কারী ও অপরাধীদের পরিবর্তে সাধারণ মানুষ বেশী ভয় পান তাদের। নিরপরাধ সাধারণ মানুষের বন্ধু হবার পরিবর্তে তারা হয়ে পড়েন জনগণের আতঙ্ক। জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায় করে দেবার পরিবর্তে তাদেরকে ফাঁদে ফেলে অর্থ-সম্পদ আদায় করার ব্যবস্থা করেন এ সমস্ত ব্যক্তিরা।

অনৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিবর্জিত পরিবেশে বড় হয়ে উঠা এসব ব্যক্তিবর্গ যখন আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের হাল ধরেন তখন ভাল-মন্দ, স্বজাতীয়-বিজাতীয়, কল্যাণ-অকল্যাণ ও শ্লীলতা-অশ্লীলতার কোন ধার এঁরা ধারেন না। এজন্য সংস্কৃতির নামে চালু হয় অপসংস্কৃতি, নোংরামী,

অশ্লীলতা ও ধর্মবিরোধিতা। সাহিত্য-সঙ্গীত, চারুকলা, নাটক কোনটাই বাদ যায় না। এদের প্রাত্যহিক অনৈতিকতার প্রচার তরুণ সমাজকে ঠেলে দেয় সামাজিক মূল্যবোধ বিবর্জিত অনৈতিক কর্মকান্ডে। এসবের কারণে ভেঙ্গে পড়ে আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য কোন সঠিক কর্মসূচী কি আমাদের জাতীয় জীবনে সচেতনভাবে কেউ গ্রহণ করেছে? কিছু কিছু বেসরকারী সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, যাদের সংখ্যা হাতে গোণা, কিছু গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে যুব সমাজের নৈতিকতার ও মূল্যবোধের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এদের কর্মক্ষেত্র জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী সীমাবদ্ধ। এছাড়াও এঁরা প্রতিনিয়ত বাঁধা ও সমালোচনার সম্মুখীন হন একশ্রেণীর কুপমন্ডুক সংস্কৃতিসেবী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর যারা এদের কর্মকান্ডকে বিতর্কিত করার জন্য সত্য-অসত্য মিলিয়ে অপপ্রচারে লিপ্ত হন কোন ধরনের নৈতিকতার বালাই না রেখে। এদের সহযোগিতা দান করেন নৈতিকতা বিবর্জিত ও কায়েমী স্বার্থের ঝান্ডাবাহী একদল গণমাধ্যম (মিডিয়া) কর্মী যারা হলুদ সাংবাদিকতায় অভ্যস্থ, যে ব্যাপারে তারা লজ্জা-শরমের কোন ধার ধারেন না।

কিন্তু এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। এর লাগাম টেনে ধরে একে থামিয়ে দিতে হবে। একে চালিত করতে হবে নৈতিকতা নির্দেশিত ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত সঠিক পথে। এজন্য সরকারীভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের সত্যিকার কল্যাণাকাঙ্খী তাঁদেরকেও আলস্য ঝেড়ে ফেলে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সরকারী পদক্ষেপগুলোর মধ্যে যা আমাদের প্রথম করণীয় তা হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ঢেলে সাজানোর। রাষ্ট্রের এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কর্মী তৈরী করার উদ্দেশ্য যে শিক্ষার তাকে পরিবর্তিত করতে হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে নৈতিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এ নৈতিকতা আমাদের দেশজ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে হতে হবে। ধর্মীয় নৈতিকতার সাধারণ ধারণা আমাদের সমাজে স্বতঃই বিদ্যমান। এ ধারণাকে প্রায়োগিক রূপ দিতে হবে। শিক্ষার সর্বপর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে নৈতিকতার শিক্ষা (Moral Studies) দিতে হবে। নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা কর্পোরেট ব্যবস্থার জন্য দক্ষ কর্মী তৈরী করবে নিঃসন্দেহে কিন্তু সৎ মানুষ তৈরী করবে না, যা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হলো দেহ, মন ও আত্মার সুষম বিকাশ, যেমন বলেছেন জর্জ বার্নার্ড শ, “Education is the harmonious development of body, soul and mind”

নৈতিকতা, সততা, আত্মত্যাগ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, উদারতা ও দায়িত্বশীলতার মতো মানবীয় চরিত্রের অন্যান্য সুকুমার গুণাবলী অর্জন ব্যতিরেকে তরুণদের কাছ থেকে আমরা কল্যাণকর আচরণের আশা করতে পারি না। এসবের শিক্ষা এবং সামাজিকভাবে লালন ব্যতিরেকে তারুণ্যের অবক্ষয় ঠেকানো সম্ভব নয়।

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও সরকারীভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ-তরুণীদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা যেতে পারে। এ সমস্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে তরুণদের উদ্দীপ্ত করা ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ করে গড়ে তোলা যায়। আমার ছাত্রজীবনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশের এ রকম একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। Kursus Bina Negara (Nation Building Course) নামে এ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজক ছিল মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দফতরের যুব উন্নয়ন বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে দূরে এক রিক্রিয়েশনাল ফেসিলিটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পঞ্চাশের কিছু বেশী ছাত্রছাত্রীকে। সেখানে জাতীয় সমস্যা ও সম্ভাবনার বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃত্ব উন্নয়ন ও বিকাশ (Leadership development) বিষয়ে সামষ্টিক আলোচনা হয়। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের প্রস্তাবনা পেশ করে জাতীয় সমস্যা সমাধান বিষয়ে। এ সমস্ত একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ছিল নিয়মিত জামা'আতে নামাজের ব্যবস্থা। ফজর ও মাগরিবের পরে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জিকির (মা'সুরত) প্রত্যেক নামাজের জামা'আতের পরে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে ছোট ছোট তাজকিরা বা সংক্ষিপ্ত ধর্মীয় উপদেশ। এছাড়াও ছিল ৫ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ শিবিরে বিনোদনমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড। এখানে ছিল না কোন উচ্ছৃঙ্খল বাড়াবাড়ি। বরং নৈতিকতা ও শালীনতার সীমার মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা, জঙ্গল ভ্রমণ (Jungle Treking), নৌকা বাইচ, সমুদ্র সৈকত ভ্রমণ সহ আরো অনেক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে।

আমাদেরও প্রয়োজন রয়েছে এ ধরনের নিয়ন্ত্রিত ও তত্ত্বাবধানকৃত (Controlled and Supervised) শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের। নাহলে অনিয়ন্ত্রিত, উদ্দেশ্যহীন ও বেলেল্লাপনায় ভরপুর আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করবে এমন সব ব্যক্তিরা যারা ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য রাখেন না। আর পরিণতিতে বুড়িগঙ্গায় ঘটে যাওয়া ঘটনার মত বিয়োগান্তক ঘটনার জন্ম হবে বার বার।

অ্যনতিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপসংস্কৃতির বাহন হিসেবে কাজ করে আমাদের কিছু গণমাধ্যম। এসবের নিয়ন্ত্রণের জন্য থাকা উচিত সুস্পষ্ট কর্মসূচী ও বিধিমালা। আকাশ সংস্কৃতি, যার প্রধান বাহন হলো স্যাটেলাইট টেলিভিশন, তার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকা উচিত আমাদের। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়া এবং ইরান উদাহরণ হতে পারে। মালয়েশিয়ার রয়েছে নিজস্ব স্যাটেলাইট এস্ট্রো। সেখানে কোন বিদেশী চ্যানেল দর্শকরা সরাসরি দেখতে পারেন না। বিদেশী চ্যানেলগুলো ধারণ করে এস্ট্রো এবং এরপর তারা এর পুনঃসম্প্রচার করে। এজন্য প্রকৃত সম্প্রচার সময় ও মালয়েশিয়ান গ্রাহকদের অনুষ্ঠান প্রাপ্তির মধ্যে থাকে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান। পুনঃসম্প্রচার বা Rebroadcasting এর মাধ্যমে এস্ট্রো দেশজ সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জন্য ক্ষতিকর অংশগুলো ছাঁটাই করে দেয়। ফলে জনমন বিষিয়ে তোলার মতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

নতুন তরুণ প্রজন্মকে কলুষিত করার জন্য আরেকটা শক্তিশালী মাধ্যমে হলো ইন্টারনেট। তরুণ প্রজন্মের মেধা ও প্রতিভার বিকাশে এবং একটা দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইন্টারনেটের রয়েছে বিরাট ভূমিকা। কিন্তু সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকলে এ মাধ্যমটিকে অসৎ, অসামাজিক ও অনৈতিক কাজের বিস্তার ঘটানোর জন্য অত্যন্ত সহজে ও সুদক্ষভাবে ব্যবহার করা যায়। আর এব্যাপারে অসাধু ইন্টারনেট ক্যাফে মালিকরা ইতোমধ্যে আমাদের অনেক তরুণ-তরুণীর বিপথগামীতার পথ সুগম করে দিয়েছেন। সুস্পষ্ট নীতিমালা সহ যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটা অংশকে ইন্টারনেট ক্রাইম ঠেকানোর কাজে লাগানো উচিত কর্তৃপক্ষের।

আমি উপরে তারুণ্যের অবক্ষয়ের কয়েকটা দিক ও তার পরিণতি এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের মাত্র সামান্য ক'টা বিষয় পেশ করেছি। এ ব্যাপারগুলোর দিকে যদি নজর দেয়া না হয় তাহলে আমাদের সমাজকে দুর্নীতি ও অপরাধমুক্ত করা সম্ভব নয়। দুনিয়ার কোন সমাজকেই ১০০% দুর্নীতি ও অপরাধ মুক্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু যথাযথ শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা এবং কর্তৃপক্ষের আন্তরিক ও পরিকল্পিত উদ্যোগ এ সমস্যাগুলোকে নিম্নতম মাত্রায় পৌঁছে দিতে পারে যা জনজীবনকে পরিশীলিত ও শান্তিময় করার জন্য জরুরি। যদি এধরনের পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয় তাহলে বার বার আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হবে। ক্ষণে ক্ষণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে (যদি এই পদ্ধতি বহাল থাকে) কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন মানুষকে আশান্বিত করতে। কিন্তু তারপর সব কিছু আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে যা আমরা কেউই চাই না।